লোকগীতির ধারায় কাজী নজরুলের গান

কল্যাণী কাজী

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সঙ্গীত ও সাহিত্যে যুক্ত করেছেন যুগমাত্রা। তিনি একাধারে ছিলেন, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্প লেখক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক এবং অনুবাদক। অপরদিকে তাঁর বড়ো কৃতিত্ব হল— তিনি একজন সার্থক গীতিকার, সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক। বাংলাগানের বিভিন্ন ধারায় তার ছিল অনায়াস বিচরণ। তিনি নিজেও বাংলাগানের ক্ষেত্রে কিছু নতুন ধারার প্রবর্তন করে বাংলাগানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। রাগসঙ্গীতের দ্বারা তিনি ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সঙ্গীতে নজরুলের ঔৎসুক্য ছিল অপার। কত বিচিত্র সঙ্গীত বিষয়ে তিনি কৌতূহল বোধ করেছিলেন এবং কত অল্প সময়ে নিজের উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে নানা ধরনের বিচিত্র বিষয়কে নিজের সঙ্গীকর্মের অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন— বাংলাগানের ইতিহাসে সে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

যদিও গজল, শ্যামাসঙ্গীত, রাগপ্রধান প্রভৃতি গীত শাখায় নজরুলের অবদান প্রবলভাবে অনুভূত হয়— তবুও লোকগীতিতেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা কাব্যগীতিতে প্রথম লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রধানত বাউল সুরের ঢঙে গান রচনা করেন। কিন্তু নজরুল বাংলা লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন শাখা অবলম্বন করে গান রচনা করে এই ধারাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলেন। ঝুমুর, ঝাপান, বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, দেহতত্ত্ব— প্রভৃতি, নানারকমের লোকগীতির সুরের গানে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ।

নজরুলের লোকগীতির ক্ষেত্রে ঝুমুরের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণির গানে তাঁর ঝুমুর একটা বিশেষ ও ভিন্ন মেজাজ সৃষ্টি করেছে। কবির বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পাতালপুরী বাণীচিত্রে'র জন্য নজরুল সাঁওতালী ছাঁদের ঝুমুর গান রচনা করেন। তিনি নিজেও কয়লাখনি এলাকার লোক; সে অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। তাই কয়লাখনি অঞ্চলের কাহিনী নিয়েও রচিত বাণীচিত্রের জন্য ঝুমুরের ঢঙে গান রচনা তার পক্ষে যেমন স্বাভাবিক ছিল তেমনই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

ঝুমুর সাঁওতালী গীত থেকে উৎপন্ন। আদিবাসীদের এক বিরাট অঞ্চলে ঝুমুর প্রচলিত। ঝুমুর গানের একটা জমজমাট আনন্দ আছে, একধরনের ছন্দদোলা আছে যা মনকে হঠাৎ খুশির আনন্দে মাতিয়ে তোলে। আদিবাসী সঙ্গীতের স্তর থেকে ঝুমুর বাংলা লোকগীতির স্তরে উত্তীর্ণ হলেও এর ঢঙে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে যায় যা বাংলালোকগীতির অন্যান্য শাখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। নজরুল চমৎকার ভাবে ঝুমুরের এই ব্যতিক্রমী ঢঙটি তাঁর গানে উপস্থাপিত করেন। বাঁশি আর মাদল এই গানের প্রধান ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। কয়লাখনির জীবন, নরনারীর ভালোবাসা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা, প্রাকৃতিক শোভা প্রভৃতি বিষয়ে রচিত নজরুলের অনেক গানে ঝুমুরের ছন্দদোলা দেখা যায়। তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঝুমুর হল— 'এই রাঙামাটির পথে লো নিমফুলের মউ, পিয়ে ঝুম ঝুম ঝুমরানাচ' 'কালো জলও ঢালিতে' 'চুড়ির তালে নুড়ির মালা' 'ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে গাছে' প্রভৃতি। 'চোখ গেল পাখিরে' গানটির সুরে ঝুমুরের ছন্দদোলা ব্যবহার করেছেন।

বাংলা লোকগীতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারার অন্যতম হল ভাটিয়ালি, নদীপ্রধান পূর্ব ময়মনসিংহ এবং সিলেটের নিম্ন অঞ্চলে এই গান বিশেষ ভাবে প্রচলিত। ভাটিয়ালি কথাটার সঙ্গে স্রোতের ভাটির দিকে যাওয়ার সম্পর্ক আছে। ভাটির দিকে নৌকা ছেড়ে মাঝিরা উদাত্ত কণ্ঠে লম্বা টানে ভরা সুরে এই গান গায়। ভাটির টানে নৌকা চললে মাঝিদের শ্রম লাঘব হয়। তাই তারা তখন অনায়াসে লম্বাটানে গলা ছেড়ে গান গাইতে পারে। ভাটিয়ালির বিষয়বস্তু সাধারণত মাঝিদের জীবন কাহিনী, নদীতীরের দৃশ্যাবলী, বা মাঝিদের নায়ক করে বর্ণিত প্রেম বা বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। তবে মাঝিরাই যে এই গানের একমাত্র গায়ক তা নয়, মাঠের কাজের অবসরে কৃষক বা বিশ্রামরত রাখাল— এরাও ভাটিয়ালি সুরে গান করে। লোকগীতি সাধারণত সমবেত সঙ্গীত, কিন্তু ভাটিয়ালি একভাবে গাওয়া হয়।

ভাটিয়ালি গানের ঢঙেও নজরুল বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। ভাটিয়ালি আঙ্গিকে রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকের 'একূল ভাঙে ও কূল গড়ে নদীর খেলা' দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অসাধারণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল শচীন দেব বর্মনের গাওয়া 'পদ্মার ঢেউরে' গানটি— যা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে, ভাটিয়ালির ঢঙ অবলম্বনে রচিত কয়েকটা নজরুলগীতি— 'আমার গহীন জলের নদী' ও 'কূলভাঙা নদীরে' 'বনবিহঙ্গ যাওরে উড়ে' 'আমার সাম্পান যাত্রী না লয়' 'ওরে মাঝি ভাই' 'কুচবরণ কন্যারে তোর' 'কোন বিদেশের নাইয়া', 'আমি ময়নামতীর পাড়ি দেব' প্রভৃতি। 'শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে' গানটির সুরে ভাটিয়ালির প্রভাব দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম ভাওয়াইয়া গানের ঢঙে দুটি গান রচনা করেন। গান দুটো হল 'নদীর নাম সই অঞ্জনা' আর 'পদ্মদীঘির ধারে ধারে'। এই গান দুটো সৃষ্টি সম্পর্কে আব্বাসউদ্দীন আহমেদ জানিয়েছেন 'আমার ভাওয়াইয়া গান কাজীদা খুব পছন্দ করতেন। তাই 'নদীর নাম সই কচুয়া/মাছ মারে মাছুয়া' আর 'তোরসা নদীর পারে লো/দিদিলো মানসাই নদীর পারে।'— এই দু-খানা গানের সুরে তিনি মেগাফোনের জন্য উপরোক্ত গান দুটো লিখলেন।'

নজরুলের বাউল গানের ঢঙে বেশ কিছু আকর্ষণীয় গান রচনা করেন। বাউল দিব্যভাবের গান। বাউলের দেহই ঈশ্বরের দেউল। এই গান বাউল সাধকদের কর্ম হলেও অন্যান্য গীতিকারগণও প্রচুর বাউল রচনা করেছেন। অন্য শ্রেণির গানেও বাউল সুরের ব্যবহার করেছেন। নজরুল বেশ কিছু বাউল গান রচনা করেছেন। কোথাও তিনি বাউলসুরের দেশজ রূপকে ব্যবহার করেছেন, কোথাও এর মার্জিত রূপকে ব্যবহার করেছেন। নজরুলের কিছু বাউল গানের পদ এমনি যে, পড়ামাত্রই তাকে বাউল বলে চেনা যায়। নজরুল সৃষ্ট কয়েকটি বাউলাঙ্গের গান হল— 'আমি বাউল হলাম ধূলিপথে' 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল' 'মোর লীলাময় লীলা করে' 'তুমি দুঃখের বেশে এলে বলে' 'ভবের এই পাশা খেলায়' 'গেরুয়া রঙ মেঠোপথে বাঁশরি বাজায়ে কে যায়'— প্রভৃতি।

নজরুল ঝাপান বা বেদে-বেদেনীর গান লিখেছেন। সাপ, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর, চাঁদ সওদাগর, মনসা, বেদে-বেদেনীর জীবন যাত্রা এই গানের সনাতন বিষয়বস্তু। ঝাঁপি খুলে সাপের খেলা দেখাতে এই গান বেদেরা গায় বলে এই গানের নাম ঝাপান। বাণীচিত্র ও আলেখ্য রচনার প্রয়োজনে নজরুল এই ধরনের গান লিখতে ব্রতী হয়েছিলেন। 'সাপুড়ে' বাণীচিত্রের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি বেদে-বেদেনীর গান রচনা করেছিলেন। ছবির সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল নজরুলের 'সাপুড়ে' ছবির জন্য গান লেখা প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন— 'সাপুড়ের চিত্রনাট্যও সংলাপ কাজীদা'রই লেখা। সাপুড়ের কাহিনী ও গীতরচনা কাজীদাই করেছিলেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। বেদে-বেদনীর গলায় গান। আমি ওদের জীবনযাত্রা বা সঙ্গীতের সঙ্গে এতটুকু পরিচিত ছিলাম না। অগত্যা কাজীদাকে আমার সমস্যার কথা বললাম। তিনি আমায় অভয় দিয়ে পাড়াগাঁয়ে বেদে-বেদিনীর খোঁজে চলে গেলেন। ... দিন দশেক পড়ে কাজীদা 'পেয়েছি। পেয়ে গেছি।' বলে বিকট চিৎকার করে এন, টি স্টুডিয়োতে প্রবেশ করে বললেন 'সব সুর তুলে এনেছি এই নাও শোন।' তারপর একে একে সব সুর শোনালেন। সেইসব সুরই ছিল সাপুড়ে ছবিতে,— যা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। 'হলুদ গাঁদার ফুল' 'কথা কইবে না' 'আকাশে হেলান দিয়ে'— এইসব গান বেদে-বেদনীর সুর থেকে চয়ন করা। সাপুড়ের গানের জনপ্রিয়তার পেছনে কাজীদা'র অবদানই বেশি।' কাজী নজরুল ঝাপান শ্রেণির গানের ঢঙ অবলম্বনে বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। 'আয়লো বনের বেদেনী', 'ওঠাও ডেরা এবার দূরে যেতে হবে', 'কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো শ্বশুর সওদাগর', 'চিকন কালো বেদের কুমার', 'ছন্নছাড়া বেদের দল', 'বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয়, সাপুড়িয়ারে বাজাও' ইত্যাদি।

লোকগীতি রচনার যে সনাতন ধারা, নজরুল তার অন্তর্গত নন, তবু তিনি এ ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। সাধারণত লোকগীতি লোককবির রচনা। ভাটিয়ালি, বাউল, ঝুমুর, সারী প্রভৃতি গান আবহমান কাল ধরে লোককবির শিল্পকর্ম। নজরুল লোককাব্যে মনযোগী না হয়েও বাংলা লোকগীতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করতে পেরেছেন। প্রতিভাবানের অনেক কিছুই সম্ভব, নজরুলের লোকগীতি তারই একটি দৃষ্টান্ত। নজরুল রচিত প্রায় ১৫০টির মতো লোকসংগীতানুগ গান পাওয়া যায়। বৈচিত্র্য যে নজরুলের সঙ্গীত রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাই লোকসংগীতানুগ ধারায় প্রতিফলিত হয়।